অন্বেষা

(ডিজিটাল সাংস্কৃতিক পত্রিকা)

ANWESHA

(A DIGITAL LITERARY MAGAZINE)

ARICARE

প্রথম সংখ্যা (First Publication)

2021

সম্পাদনা :: ডঃ চৈতালী দত্ত, ডঃ অশোক মজুমদার, শ্রীমতি স্মৃতিরেখা ঘটক

বর্ণ - সংস্থাপন : মৌসুমী মুখার্জী

সূচিপত্র

(CONTENTS)

****

▲ বিবেক চূড়ামণি	বি.ডি.মন্ডল	4
▲ রক্তদান	দেবাশীষ পাল	5
▲ রোদ - বৃষ্টি বিকাশ	মুক্তিসাধন বসু	8
▲ জীবন এখানে	লীলাময় পাত্র	10
▲ মুনাফা	অশোক কুমার মজুমদার	12
▲ বৃষ্টি আসুক	চৈতালী দত্ত	14
▲ স্বপ্নের মেলবোর্ন	গৌতম রায়	15
▲ ইলিশের ইতিকথা	মুক্তিসাধন বসু	32
▲ ঘুরে এলাম নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার	তনুরুপা কুন্ডু সঙ্গে দিলীপ কুন্ডু	33
▲ A journey to the ancient 'lost city' of Petra in Jordon	K.K.Satapathy	39
▲ Agni Kanya Bina Das	Dr. Utpala Parthasarathy	44

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ARICARE এর সদস্য ও প্রথিতযশা লেখক DR. GOUTAM ROY এর কাছ থেকে যে সাহায্য এবং পরামর্শ " অন্বেষা " পেয়েছে তার জন্য ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত ভাবে তিনি ধন্যবাদর্ঘ্য।

বিবেক চূড়ামনি

বি.ডি.মন্ডল

এখনো পথ অনন্ত, বিপন্নতার ভিড়

হৃদয় কম্পমান আয়ু ভারাক্রান্ত,

সায়াহ্নের এক সোপান পার হতেই

সম্মুখে দন্ডায়মান এক এক মহাকাল -

ওপরে অনন্ত আকাশ

স্বপ্ন দেখার চোখ ভয়ার্ত।

চাঁদ লুকিয়েছে মেঘের আড়ালে

মিটি মিটিরাও সঙ্গী।

সহসা দেখি একবিন্দু বায়ু দূরে স্থির,

ক্রমশ রূপ নেয় অগ্নিকুন্ডের বোধন,

তাই দেখে ছুঁড়ে ফেলি আপন অবয়বের কুন্ডলী -

ভগ্নাবশেষ স্তূপীকৃত হয় শবের চিতায়।

রুপোর কাঠি বললো আমি বেঁচে আছি

ফুসফুস ধুকপুক বাদ্য অনার্য তৃষার দুন্দুভি

উৎসর্গ মুদ্রায় শীর্ণ দুবাহু উর্দ্ধপানে

বুকের ভিতর শায়িত বিবেক চূড়ামণি

ভয়ার্ত বিজ্ঞ চোখে অশরীরী বাণী।

রক্তদান

দেবাশীষ পাল

শহরের হাসপাতালে, হাসপাতালে, নগরের ক্লিনিকে, ক্লিনিকে,
ব্লাড ব্যাংকে, আরো কত দিকে দিকে নিয়ত চলছে রক্তদান।
কেহ বা মহৎ উদ্দেশ্যে আবার কেহ বা শুধুই হতে চায় পুণ্যবান।
ফুটাইতেছে তারা কত শত হাসি কত ঘরে ঘরে,
ফিরাও কত শোকাচ্ছনা জননীর মিলিয়ে যাওয়া হাসি,
দর্শাও কত প্রেয়সীর হারাতে বসা আলোর ঠিকানা দিশি দিশি।
কত রুগী পায় পরিত্রান – কত ফিরিতেছে আশাহত প্রাণ,
এ আনত শির আজি তাই করে তাদের সবার সম্মান।
কিন্তু বন্ধু গ্রামে গঞ্জেও যে নিত্য চলেছে রক্তদান,
পেয়েছো কি কখনো তার সন্ধান?
পাওনি ? জানি আমি সে খোঁজ পাবে না কোনোদিন ও,
তবু তুমি জেনো,
সেথায় চলেছে নিরন্তর নীরবে এ রক্তদানের মেলা,
সে শুধু জানি আমি আর পরে থাকা ঐ পথের তৃণ।
অবশ্য সে তথ্যের হিসেবে রাখবে না জেনো কোন ব্লাড ব্যাঙ্কের খাতা,
আর লিখবেই বা কত,
লিখলে তো শেষ হয়ে যাবে, ভরে যাবে হিসাবের সব পাতা,
যেথা পড়ে আছে যত।

ঐ যে দেখছো লাঙ্গল হাতে কালু মোটেকে,

বৈশাখী মধ্যাহ্নের অগ্নিক্ষরা অর্ক যার বাড়িয়ে চলে দর দর ঘাম

কিংবা ঐ যে দেখছো বীজ পোঁতা ফাতেমা বিবিকে,

আষাঢ়ের নিরলস জলসিঞ্চনে সিক্ত করি যারে অবিরাম,

ঐ যে জাল নিয়ে জেলে – ঐ যে কুমোর অনলস চাকা ঘুরিয়ে চলে,

ঐ যে মেথর দেখছো ঝাঁজর হাতে – ঐ যে কামার সদা মুদগর নিয়ে ঘাতে,

আরো কত কত,

জনান্তিকে ঝড়িয়ে চলে তাদের রুধির স্রোত।

তাদের সে স্নেহের দান - ফিরায় যে সমাজের প্রাণ,

অহরহ ঝরায় সে সমাজের মুক্তোঝরা হাসি।

তবুও কি টানবে না তাদের বন্ধু একবার ভালোবাসি।

তোমার ধমনীতে বহে যে তীব্র শোনিত ধারা,

একবারো ভেবেছো কি - সে দান করে তব কারা ?

বৈভব বিভূতির জ্বলিছে যে দীপ তোমার আগারে,

সৃষ্টির শুরু হতে এক নাগাড়ে,

একবারো ভেবেছো কি সে জোগাইতেছে সেথা কারা ?

একটু ভেবে দ্যাখো,

জানো না তো? তবে জেনে রাখো।

শতাব্দী-কাল ধরি - অশ্রুকে সম্বল করি,

বুভুক্ষার জ্বালা সহি - আঘাতে আঘাতে দহি,

দলিত ক্ষয়িষ্ণু প্রাণে - তবু তারা হাসি মনে,

গেয়ে সমাজ গড়ার গান - নীরবে করে চলে রক্তদান,

তোমার ধমনী'পরে নিরন্তর বহে চলে,

সে তো সেই তাদেরই দত্ত রক্তিম রুধির ফলে।

রোদ - বৃষ্টি বিকাশ

মুক্তি সাধন বসু

ভরা রৌদ্রতে হঠাৎই বৃষ্টি
না কোনো আভাস না পূর্বাভাস
না বাদল মেঘের আনাগোনা
ছিলোনা প্রস্তুতি পাখির ডানায়
পথে জনপদে পায়ের ব্যস্ততা,
আচম্বিতে এলো মেঘকে এড়িয়ে
আকাশ থেকে আশীর্বাদী জল
সোঁদা মাটির গন্ধে ভেজা সুখ
জানি ক্ষনিকের, এক নিমেষের।

ভরা জীবনেতে হঠাৎই বিপর্যয়
সশস্ত্র শাসনের রক্তাক্ত সুনামি
মাথার উপর ওজোনের ছেঁড়া কাঁথা
অতিবেগুনির অদৃশ্য বিকিরণ,
সুখ পোড়ে শোনিতে স্নায়ুতে
ত্বক পোড়ে রঙে রসায়নে
মুখ পোড়ে মানবিকতায়

অতি সক্রিয় সুক্ষ্ম জীবাণু

মৃত্যুর চুক্তিপত্রে দর কষাকষি।

মানচিত্রে চরিত্রের চিত্র বদল

কালির আঁচড়ে আঘাতে সংঘাতে

উপত্যকা কাঁপে বিদ্বেষে বারুদে

নড়ে উঠে সীমারেখা সভ্যতার ভীত,

ক্রমাগত অবক্ষয় গঙ্গায় ভাঙ্গন

সমাজের মৃত মুখ চিতায় সাজানো

অঙ্গীকার জ্বলে, রাত কাঁপে সমবেদনায়

আবার আচমকা বৃষ্টি, শান্তির প্রলেপ

কলঙ্ক মোচন, বিকাশের বার্তা বাতাসে।

জীবন এখানে

লীলাময় পাত্র

আকাশ, তোমার মনের জানালা খোলা

মেঘ আসে যায়

পাখির ডানায়,

আজ মেঘলা সারাবেলা।

বাতাস, তোমার সুরের বাঁশিটা বাজে

মন ছুঁয়ে যায়

ফুলকে দোলায়

বৃষ্টি করে টাপুর টুপুর খেলা।।

মন চায় উড়ে যায়

আকাশের সীমানায়,

মন বন্ধু ফিরে পায়,

জীবন এখানে হৃদয়ের টানে

জীবনের গান গায় ।।

মন চায় ভেসে যায়

মিলনের মোহনায়,

ভয় ঢেউ সরে যায়

মন কূল খুঁজে পায়,

জীবন এখানে ভালোবাসা দিয়ে

ভালোবাসা ফিরে পায় ।।

মুনাফা

অশোক কুমার মজুমদার

নদীর কিনারে কোকিলের ডাক

পাটকলের তাঁতের শব্দ

ঠিক যেন বিসমিল্লা,

রবিশঙ্করের ফুলবন্দী।

একটার পর একটা পাট বোঝাই

গাড়ী যাচ্ছে দূর দূরান্তে,

মালিক বলছে মুনাফা হচ্ছে না।

একদিকে উড়োজাহাজে

প্রায় দেখি ওরা যাচ্ছে

ছেলেমেয়েদের বিদেশে

উচ্চশিক্ষা দিতে।

ঠিক যেন কোকিল এসেছে

ডিম্ পাড়তে কাকের বাসায়।

বাচ্চা হলে মায়ের কাছে পালাবে

যেমন শিক্ষা শেষে,

আমেরিকা ইউরোপ থেকে

ফিরে ছেলে মেয়েরা,

পিতৃপুরুষের গদিতে বসবে।

যুগ যুগ ধরে মালিক বলছে

লাভ হচ্ছে না, বোনাস দিতে

পারবো না।

বৃষ্টি আসুক

চৈতালী দত্ত

বৃষ্টি আসুক, ভিজিয়ে দিক

শুকনো ঘরবাড়ি।

ভিজিয়ে দিক বুকের মধ্যে

নির্জনতা ভারী-

ভিজে আকাশ হৃদয়ভারে

নামুক মাঠের পাশে,

বৃষ্টি জলকণা সব

আসন পাতুক ঘাসে।

ভেজা শহর, আবছা শহর

পুব আকাশে চেয়ে -

দিগন্তিকায় পৌঁছতে চায়

ইন্দ্রধনু বেয়ে।

ঠিক তখন ই মনের মাঝে

প্রশ্ন ফিরে আসে -

" এখনো সে তেমনি করে

আমায় ভালোবাসে ?"

স্বপ্নের মেলবোর্ন

গৌতম রায়

সে অনেক বছর আগের কথা, তখন ১৯৯৭-৯৮ সাল। সেই সময় ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক আমার লেখা বেশ কয়েকটি কম্পিউটারের বই বেশ অনেক সংখ্যায় কিনতো এবং অনেকগুলি দেশে তা পাঠ্য বই হিসাবে পাঠাত। সেই সুবাদেই ওই সময় তাদের আমন্ত্রণে আমায় বেশ কয়েকটি দেশে যেতে হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দিন ছিলাম অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরে। এই শহরের কিছু নিজের চোখে দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলবো বলেই একটু লিখতে বসলাম। সাধারণত নিজের কাজের পরিধি বা নিজের সম্বন্ধে বেশি কথা আমি একেবারেই বলতে ভালোবাসি না। বলি ও না। কিন্তু সেখানকার কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হলে তার কার্যকারণ সম্বন্ধে কিছুটা না বলতে পারলে নিজেরই মনে হবে যে কোনো এক রূপকথার গল্প বলছি আমি, আর তাই ওপরের কথাগুলো বলতেই হল। আর সেইজন্যই বলছি- না, এটা কোনো রূপকথার গল্প নয়। ভ্রমণ কাহিনীও নয়। এটা নিজের দেখা কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

কোয়ান্টাসের ফ্লাইট মেলবোর্ন এয়ারপোর্ট পৌঁছনোর আগেই এক বিরাট চমক ছিল আমার জন্য। ফ্লাইট যখন প্রায় মেলবোর্নের আকাশে এসে গেছে তখন এয়ার হোস্টেস ঘোষণা করলো যে এই দেশে কোনোরকম খাবার নিয়ে প্রবেশ নিষেধ। যাদের কাছে সেরকম কোনো খাবার আছে, তারা যেন এয়ারপোর্টে রাখা বিন এ সেগুলো ফেলে দেন। আর – সবাইকে ডিক্লারেশন দিতে হবে যে তাদের কাছে কোনো খাবার নেই। এই ঘোষণার পর সবাইকে তাদের সুবিধেমতো চাইনিস ভাষায় অথবা ইংরিজি ভাষায় ছাপানো ফর্ম দিয়ে গেলো। বিপদে পড়ে গেলাম আমি। আমার কাছে তখন ছিল মায়ের দেওয়া অনেক মুড়ি, চানাচুর আর চিড়ে ভাজা। কিন্তু সেগুলো কিছুতেই আমার ফেলে দিতে ইচ্ছে করলো না। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে একটা চাইনিস ফর্ম নিয়ে পাশের লোকের ইংরিজি ফর্মটা দেখে সেইমতো ডিক্লারেশন দিলাম যে আমার কাছে সেরকম কিছু খাবার দাবার নেই।

এয়ারপোর্ট পৌঁছনোর পর ডিক্লারেশন ফর্ম জমা দেবার জন্য লাইনে দাঁড়ালাম। আমার পালা আসার পর আমি সেই চাইনিস ফর্মটা জমা দেবার সময় আমার চালাকি ধরা পড়ে গেল। কাউন্টারের ভদ্রমহিলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমায় বললো - তুমি কি এই ভাষাটা জানো? আমি বললাম - না জানিনা। আবার জানতে চাইল - তাহলে ফর্ম টা ফিল আপ করলে কি করে? আমি অম্লান বদনে বললাম - পাশের প্যাসেন্জারের ইংরিজি ফর্ম টা দেখে। ভদ্রমহিলা আমার উত্তর শুনে আমায় একটা ইংরিজি ফর্ম দিয়ে বললো - তাহলে এটা পড়ে বুঝে নতুন করে আবার ফিল আপ করে দাও। নিরুপায় হয়ে একই কথা লিখে দিলাম যে আমার কাছে কোনো রকম খাবার নেই। ভদ্রমহিলা ফর্মটা নিয়ে বললো - ওকে! এবার তাহলে গ্রীন চ্যানেল দিয়ে বেরিয়ে যাও, কিন্তু ফর্মে ঠিক কথা না লেখা থাকলে হেভি ফাইন করা হবে, আর এই দেশেও ঢুকতে দেওয়া হবে না। কিন্তু তখন তো আর নতুন কথা কিছু লিখতে পারবো না। তাই খুব ভয়ে ভয়ে গ্রীন চ্যানেলের দিকে গেলাম। চ্যানেল পেরুনোর সময় ভাবলাম - এবারের মতো বেঁচে গেলাম! কিন্তু না। চ্যানেল পেরুনোর পরেই একজন আমায় দাঁড় করলো। তার সাথে

বিশাল বড়ো বড়ো তিনটি কুকুর। তারা এলো এবং সমস্ত ব্যাগ শুঁকে দেখতে লাগল। কিন্তু আমার কপাল দেখলাম খুবই ভালো। ওই কুকুরেরা নিশ্চয়ই আগে কোনোদিন মুড়ি, চিঁড়ের গন্ধ শুঁকে দেখেনি। তাই ওদের কাছে কোনো খাবারের গন্ধ সেদিন ধরাও পড়েনি। আমিও সেই সব খাবার গুলো বেশ কয়েকমাস ধরে পরে খুব আনন্দের সঙ্গে খেয়েছিলাম।

মেলবোর্নের যে কলেজে ভারতবর্ষ থেকে আমার মতো অন্যান্য কয়েকজনও গিয়ে পৌঁছলাম যখন, তখন এখানে মার্চ মাস। গ্রীষ্ম কাল। কিন্তু ওখানে তখন শীত। ওটা দক্ষিণ গোলার্ধের দেশ। ওদের দেশের আবহাওয়া ও জীবজন্তু সবই তাই আলাদা।

শীতের সময় ওরা ডে লাইট সেভিং ব্যবস্থা ফলো করে। যেদিন এই ডে লাইট সেভিং শুরু হয়, সেদিন ওদের সমস্ত ঘড়িকে ১ ঘন্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়। আবার ৬ মাস পরে যখন সেই সময়টা শেষ হয়, ঘড়িকে আবার আগের অবস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই কারণেই ভারতীয় সময়ের চেয়ে মেলবোর্নের সময় গ্রীষ্মকালে ৪ ঘন্টা এগিয়ে থাকে, কিন্তু শীতকালে সেটাই হয়ে যায় ৫ ঘন্টা।

পৌঁছনোর পরের দিনই সকালে আমাদের উদ্দেশ্যে একটি "ওয়েলকাম মিটিং" এর ব্যবস্থা হয়েছিল। সকাল সকাল কলেজে গিয়ে দেখি একজন কোট প্যান্ট পরা সাহেব সমস্ত ঘরগুলি ঝাড়পোঁছ করছে। তখনও অন্যান্যরা এবং ওই কলেজের অন্য শিক্ষক এবং কর্মীরাও এসে পৌছননি। তাই বাধ্য হয়ে সেই ভদ্রলোককেই বললাম আমি কেন এসেছি। খুব বিনয়ের সাথেই সেই ভদ্রলোক আমাকে ওদের বিশাল সেমিনার রুমে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। হলে ঢোকার সময়ের চমক - প্রথমে ঘর পুরো অন্ধকার ছিল। কিন্তু আমরা ঘরে ঢুকতেই সমস্ত আলোগুলি নিজের থেকেই জ্বলে উঠল। এরপর আস্তে আস্তে অনেক লোকজন আসতে শুরু করল এবং একেবারে নির্দিষ্ট সময়েই সেই মিটিং শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু মিটিং শুরু হবার আগে আর ও কয়েকটি চমক অপেক্ষা করছিল। আমি ঘরে ঢোকবার সময়ে ঘরের সব আলোগুলি জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু তার একটু পরেই শুধু আমি যেখানে বসেছিলাম- সেই জায়গাটা ছাড়া বাকি সব জায়গার আলোই আস্তে আস্তে একটার পর একটা নিভে যাচ্ছিল। আবার কেউ যখন ঘরে ঢুকে কোনো সিটে বসছিল, তখন আবার তার কাছের আলোগুলো নিজে নিজেই জ্বলে উঠছিল।

পরে জেনেছিলাম- ওখানে কেউ হাতে করে সুইচ অন অফ করে না। সমস্ত স্বয়ংক্রিয় সুইচের মাধ্যমে হয়। কোনো ঘরে যদি কোনো নড়াচড়া (movement) হয় এবং সেখানে আলোর প্রয়োজন থাকে, তাহলে নিজের থেকেই আলো জ্বলে যায়, আবার বেশ কিছুক্ষন কোনো মুভমেন্ট যদি না হয়, নিজে থেকেই সেখানকার আলো নিভে যায়। শুধু তাই নয়, ঘরের যেসব জায়গায় দিনের আলো আসে জানলা দিয়ে, সেইসব জায়গার আলো বাইরের আলো কমে গেলে তবেই জ্বলবে। এমনিতে কিছুতেই সেখানে আলো জ্বালা যাবে না। ওরা এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে অনেক বিদ্যুৎ খরচ সাশ্রয় করে।

অনুষ্ঠান শেষে একটা হাই-টি র ব্যবস্থা ছিল। প্লেটে নানারকম খাবার সাজানো ছিল, সেখান থেকে প্রয়োজন মতো খাবার তুলে নিতে হচ্ছিল। কিন্তু কফি মেশিন থেকে কফি নিজেদের তৈরি করে নিতে হচ্ছিল। কিন্তু সেখানেই বিরাট এক চমক অপেক্ষা করছিল, ওই কলেজের প্রেসিডেন্ট হ্যারি নিজের কফি নেবার আগে এক কাপ কফি তৈরি করে খুব যত্ন করে তুলে দিলেন

সকালে দেখা সেই ঝাড়ুদার সাহেবের হাতে। একইভাবে ওই কলেজের প্রিন্সিপাল রজার (প্রথমেই আমাদের সবাইকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে সবাই সবাইকে তাদের নাম ধরে ডাকবে। কোনোরকম স্যার বা মিস্টার বা ম্যাডাম বলা চলবে না।) সেই একইভাবে পরম যত্নে কফি তৈরি করে হাতে তুলে দিল এক খুব সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলার হাতে। পরে জেনেছিলাম তিনি ওই কলেজের সমস্ত বাথরুম পরিষ্কার করেন। আমাদের কো-অর্ডিনেটর, জর্জ , যার সঙ্গে পরে খুবই বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল, তখন, একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে কলেজের প্রতিটি ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্মী সবাই ওই দু-জনের কাছে সবচেয়ে ঋণী, কারণ তাঁরা ঠিকমতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে জায়গাটা না রাখলে, কারোর পক্ষেই ঠিক করে কাজ করা সম্ভব হবে না।

এই ঘটনা শুধু একদিন-ই নয়, ওখানের প্রতিটি মিটিং-এ, পার্টিতে, যা প্রায়ই হতো, এটা আমি দেখেছি এবং এটাও দেখেছি, যে এটা খুব স্বতস্ফুর্তভাবেই ওখানে করে সবাই।

মেলবোর্ন শহরটা ছিল - একেবারে ছবির মতো সাজানো শহর। রাস্তার ধারে ধারে খুব সুন্দর করে সাজানো প্রায় একই ধরণের বাড়ি, আর প্রত্যেকটি বাড়িতে প্রচুর ফুলগাছ লাগানো। দূর থেকে দেখলে মনে হয় এটা যেন আসলে এটা একটা বিশাল ফুলের বাগান।

মেলবোর্নে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল প্রেস্টন এলাকায় একটা বিরাট বড়ো আপার্টমেন্টে। বাড়ির মেন্ গেটে বিশাল মোটা কাঁচের দরজা । এই দরজায় কোনো তালাচাবি বা ছিটকিনির ব্যবস্থা নেই। এয়ারপোর্ট থেকে যখন ওই বাড়িতে আমায় পৌঁছে দেওয়া হল, হাতে দেওয়া হল - একটা ক্রেডিট কার্ড - এর মতো ছোট কার্ড। সেটা ওই দরজার কাছে নিয়ে যেতেই দরজা নিজের থেকেই খুলে গেল। আমি তো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে বুঝতেই পারছিলাম না - যে ভেতরে ঢুকবো কী করে। ঠেলাঠেলি করছিলাম, দরজায় নক করছিলাম। আমায় নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা ফিরে যাবার সময়ে আমার দুরবস্থা দেখে গাড়ি থামিয়ে মুচকি হেসে আমার অক্ষমতা ক্ষমা করে দিয়ে ওই কার্ড দিয়ে ড্রাইভার দরজা খুলে দেখিয়ে দিল - কীভাবে ঢুকতে - বেরুতে হয়। পরে অবশ্য কার্ডটা রাখতাম বুক পকেটে। শুধু দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই দরজা খুলে যেত।

প্রথম দিন আমার আপার্টমেন্টের ভেতর ঢুকে দেখলাম - বিশাল ঘরের একদিকে রান্নার সরঞ্জাম আছে। একটা গ্যাস বার্নার আছে, যাতে চারটে উনুন। তার পাশে আছে একটা মাইক্রোওভেন, একটা কাবাব করার ওভেন এবং ড্রয়ার ভর্তি প্রচুর বাসন, খুন্তি , হাতা ইত্যাদি ইত্যাদি। আর বার্নারের ওপর চিমনি বসানো আছে। সেইসময়ে আমাদের বাড়িতেও গ্যাসে রান্না শুরু হয়ে গেছিল, কিন্তু সেই বার্নার এ চারটে উনুন ছিল না। তা ছাড়া এইসব চিমনি, মাইক্রোওভেন, ওভেন - কিছুই ছিল না বাড়িতে। এতো সব জানতাম ও না আমি। জানিনা তখন আমাদের দেশে সেসব কোথাও ব্যবহার হতো কিনা, বা আদৌ তখন এসেছিল কিনা।

সন্ধেবেলা সাউথ ইন্ডিয়ান এক ভদ্রলোক এসে পৌঁছল এবং আমার পাশের আপার্টমেন্টেই তার থাকার ব্যবস্থা হল। সেই রাতেই এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। হঠাৎ মাঝরাতে প্রচুর শব্দ করে দমকল এসে হাজির বাড়িতে। ওরা বললো- ওদের কাছে অটোমেটিক মেসেজ গেছে যে এই বাড়ির দোতলায় আগুন লেগেছে। কিন্তু দোতলায় তো শুধু আমি আর সেই নতুন আসা

সাউথ ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক। আমার ঘরে ওরা এসে দেখলো- কিছুই হয়নি, কিন্তু তারপর সেই ভদ্রলোকের দরজা ধাক্কা দিয়ে দেখা গেলো ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ তৃপ্তি করে খাচ্ছেন। দমকলের লোক তাকে বেশ ধমক-ধামক দিল। বললো পুরো বাড়িটায় 'নো স্মোকিং ' করা আছে। ওখানে কোথাও কোনো আগুন জ্বললে বা ধোঁয়া হলে- স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় কাছের দমকলের অফিসে খবর চলে যায় এবং তার দু-এক মিনিটের মধ্যেই দমকল চলে আসে। সেদিন না জেনে অপরাধ করে ফেলেছিল বলে ভদ্রলোককে সেরকম কিছু বললো না ওরা। শুধু বলে গেল- কিছুতেই যেন বাড়ির কোনো অংশে সিগারেট খাওয়া না হয়। অবশ্য পরে ভদ্রলোক বলেছিল, আরে দাদা, সিগারেট ছাড়া থাকবো কী করে? তাই চিমনিটা চালিয়ে দিয়ে তার নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাই।

কলেজের কোর্স ডিরেক্টর জর্জ আমায় এখানকার দ্বিতীয় দিনেই জিজ্ঞাসা করেছিল - ইন্ডিয়াতে আমি কি কি সাবজেক্ট পড়াই। আমি তখন এখান কার কলেজে সব ইয়ার, সব সিমেস্টার মিলিয়ে সব সুদ্ধু ১৭ টা সাবজেক্ট পড়াতাম। সেগুলো বললাম। জর্জ চমকে উঠলো, ভাবলো - ঠিক মতো শুনতে পায়নি ও। তারপর আমি বুঝিয়ে বললাম - আমাদের দেশে কলেজে টিচার-এর খুব অভাব। তাই অনেকগুলো সাবজেক্ট ই পড়াতে হয়! আমার কথা শুনে জর্জ ব্যাজার মুখে বলে উঠলো - তাহলে হয় তুমি একজন সুপারম্যান আর নয়তো কোনো সাবজেক্টটাই ঠিক মতো জানোনা। আমাদের এখানে একজন টিচার শুধু একটা সাবজেক্ট ই পড়ায়। অনেকে আবার একটা সাবজেক্টের কিছুটা অংশ মাত্র পড়ায়। যে যে সাবজেক্টের এক্সপার্ট, সে শুধু সেটুকুই পড়ায়।

মেলবোর্ন এ একটা ব্যাপার খুবই অবাক করতো আমায়। দেখতাম প্রতিটি মানুষ সকল বেলা বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে অতি অবশ্যই রেডিও তে বা টেলিভিশন এ সারাদিনের আবহাওয়া বার্তা শুনে, সেই অনুযায়ী প্রস্তুত হয়ে বাইরে বেরোতেন। আর অসম্ভব নিখুঁত ছিল সেই সব বার্তা। একেবারে নিখুঁত ভাবে সময় মিলিয়ে বৃষ্টি আসতো বা বলে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়েই হয়তো প্রবল বৃষ্টি থেমে গিয়ে ঝলমলে রোদ উঠতো।

এখানকার কলেজে থাকার সময়েই আমি আমার email account প্রথম তৈরী করি এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করতে শিখি।

ওখানে থাকার সময়ে প্রতি শনি-রবিবার, ছুটির দিনে ফ্লিন্ডার্স স্ট্রিট স্টেশনে চলে গিয়ে টিকিট কেটে বেড়াতে যেতাম। ওখানে সারা শহরকে তিনভাগে ভাগ করা ছিল। জোন -এ, জোন-বি , জোন-সি। কোনো একটা জোনে যাবার টিকিট কাটলে সেই জোনের সমস্ত বাস, ট্রেন ও ট্রাম এ সেই একই টিকিটে ঘোরা যেত। সুতরাং প্রতিটি বাসে, ট্রামে বা ট্রেনে আলাদা করে টিকিট কাটতে হতো না। মান্থলি টিকিটের ও ব্যবস্থা ছিল। কোনো যানবাহনেই টিকিট পরীক্ষা করার জন্য কোনো মানুষ থাকতো না। থাকতো যন্ত্র। সেই যন্ত্রে টিকিটটা ঢুকিয়ে দিলে সেটা থেকে টিকিট চেকিং হয়ে বেরিয়ে আসতো। এইভাবে আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি তখন। সবগুলো জায়গার কথা ঠিকমতো মনেও নেই এখন। যে কয়েকটার কথা মনে আছে বলছি।

একদিন গিয়েছিলাম ব্যালারেট নামের এক সোনার খনি দেখতে। এখন সেই খনি থেকে আর সোনা উত্তোলন করা হয় না। তার বদলে মাটির নিচে খনির ভেতর মালিকরা কীভাবে ওখানে Ab-Originals দের ওপর জোর করে অত্যাচার করে ওই

খনির ভেতর তাদের বন্দি করে রেখে সোনা উত্তোলন করতো - সেগুলি সব নিখুঁত মডেল করে রেখে দিয়েছে। দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয় তাদের অত্যাচারের নানারকম মডেল দেখে। ইয়ারা নদীর জল ওই খনির ভেতর দিয়েও কিছুটা বয়ে গেছে। তাই খনির বাইরে ইয়ারা নদীর ধারে ধারে অনেক ছাঁকনি রাখা ছিল। ওখানে ট্যুরিস্টরা প্রায় সবাই চেষ্টা করে নদীর জল ছেঁচে সোনার কুঁচো খুঁজে পেতে।

সেই খনির পাশে বিশাল এক প্রদর্শনী গৃহ ও আছে, যেখানে ওখান থেকে পাওয়া নানান সাইজের এবং নানারকম সোনার খন্ড খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে। এমন কি বিশাল বড়ো মাপেরও কিছু খন্ড খুব সুন্দর করে রাখা আছে।

একদিন গিয়েছিলাম ফিলিপ আইল্যান্ড বেড়াতে। ভারত মহাসাগরের নীল জলের ওপর দিয়ে একটা বিশাল লম্বা সেতু পেরিয়ে যেতে হয় ফিলিপ আইল্যান্ড এ। ওখানে মেনল্যান্ড এর চেয়ে ঠান্ডা আশ্চর্জজনক ভাবে ভীষণ বেশি। ওখানে দেখার জিনিস - ঠিক সন্ধেবেলা হাজার হাজার পেঙ্গুইন জল থেকে হেলতে দুলতে উঠে এসে তাদের বাসায় ফেরে। সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্য ওখানে প্রচুর দর্শক আসে। কিন্তু সেই দৃশ্যের ছবি তুলতে কোনোভাবেই ফ্ল্যাশ ব্যবহার করে ছবি তোলা যাবে না। বারণ আছে, কারণ তাতে ওরা বিরক্ত হতে পারে, ওদের অসুবিধে হতে পারে।

একদিন গিয়েছিলাম মেরুন্ডা ওয়াটার রিজার্ভার দেখতে। মেলবোর্ন শহরে পানীয় জল প্রধানত বৃষ্টির জল থেকে আসে। সেই সুবিশাল লেক এ বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয়। এখন থেকেই পরিস্রুত করে সারা শহরে জল সরবরাহ করা হয়।

এখানে এই বিশাল লেকটা ছাড়াও সমস্ত জায়গাটা দেখার মতো। চারিদিকে শয়ে শয়ে ম্যাপেল ট্রি। শীতকালে সেই গাছের পাতার রং টকটকে লাল। তাই চারিদিকে তখন লাল রঙের আগুনের সৌন্দর্য।

পাফিং বিল্লি মেলবোর্ণের একটা সুন্দর হিল স্টেশন। খুব সকালে ট্রেনে চাপলে দুপুরের আগেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া যায়। জায়গাটা অনেকটাই আগেকার দিনের আমাদের দার্জিলিং - এর মতো। তবে অনেক বেশি সাজানো গোছানো। আর নানান আকৃতির এবং নানান ধরণের গাছের শোভায় সুশোভিত।

ট্রেনের কথা বলতে গিয়ে একদিনের কথা মনে পড়ে গেল। ওখানের লোকাল ট্রেনগুলি অনেকটা আমাদের এখানে মেট্রোর এসি কামরার মতো। কিন্তু খুবই ফাঁকা থাকে প্রায় সবসময়ে। লোকসংখ্যা তো খুবই কম। একদিন, মনে হয় - কীসের একটা ছুটির দিন ছিল সেটা, প্রেস্টন স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে মেলবোর্ন সেন্ট্রাল -এ যাবো- কি একটা দরকারে। খাওয়াদাওয়া সেরে দুপুরের দিকে বেরিয়েছি। প্রথমে ট্রেনে অনেক লোক ছিল। কিন্তু কিছু পরে জলিমন্ট স্টেশন এসে যাওয়ায় অনেকে নেমে গেল। এখানেই বিখ্যাত MCG স্টেডিয়াম, সেদিন ওখানে রাগবি খেলা ছিল। ট্রেন তখন খুবই ফাঁকা হয়ে গেছে। আমি যে কামরায় উঠেছিলাম- সেখানে তখন আমি ছাড়া আর তিনজন মাত্র যাত্রী ছিলাম। তার আগে কোনোদিন ওদেশে ট্রেনে বা বাসে টিকিট চেকার দেখিনি। সেদিনই প্রথম দেখলাম। হঠাৎ একটা স্টেশন থেকে কালো রঙের ইউনিফর্ম পরা একজন টিকিট চেকার উঠলেন। উঠে সোজা আমার উল্টোদিকে বসা লোকটির পাশে এসে বসে প্রায় ফিসফিস করে তার কানের কাছে বললেন- আমার মনে হচ্ছে- তুমি টিকিট কাটনি। যদি কেটে থাকো- তাহলে টিকিটটা আমাকে দেখাও। আর যদি না

থাকে তাহলে হয় পরের স্টেশনে চুপচাপ নেমে যাও আর নয়তো আমি তোমার নামে ফাইন এর বিল কাটবো। কী করবো? সেই লোকটা কিন্তু তার দিকে একবারও তাকালোই না। সামনে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর পরের স্টেশন আসতে ট্রেনের দরজা খুলে গেল। কিন্তু দরজা বন্ধ হবার ঠিক আগেই সেই লোকটা হঠাৎ নেমে চলে গেল। আমি কৌতূহল না চাপতে পেরে সেই চেকার ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম - আপনি বুঝলেন কি করে যে ওই লোকটি টিকিট কাটেনি? ভদ্রলোক বললেন - ও আমরা মুখ দেখেই সব বুঝতে পেরে যাই। তারপর আবার বললাম - তাহলে আপনি এতো আস্তে আস্তে ওর সঙ্গে কথা বলছিলেন কেন? চেকার ভদ্রলোক যা বললেন - শুনে তো আমার মাথায় হাত। উনি বললেন - ওই ভদ্রলোক টিকিট কাটেনি- সেটা ওর অপরাধ, কিন্তু তাই বলে অন্য যাত্রীদের সামনে তো আর তার সম্মান নষ্ট করার কোনো অধিকার কারোর নেই। তাই না?

ওখানে রিয়ালটো টাওয়ার নামের একটা চুরাশিতলা বাড়ি আছে। সেখানে টিকিট কেটে ওপরে ওঠা যায়। ওপরে উঠে দুটো দরজা পেরিয়ে ছাদ। সেই ছাদে উঠে হঠাৎ এতো জোর হাওয়া পেলাম - যে প্রায় উড়ে যাবার জোগাড়। অবশ্য যাতে না কেউ উড়ে যায়, তাই ছাদের ওপরে মোটা তারের জালের ছাদ করা আছে। ওই বাড়ির ছাদ থেকে সমুদ্রে ঘেরা মেলবোর্ন শহর, ফ্লিন্ডার স্ট্রিট স্টেশন ও তার আশপাশ, MCG গ্রাউন্ড ভীষণ সুন্দর দেখা যায়। মনে হয় যেন একটা ছোট মডেল দেখছি ছাদ থেকে। আর এই ছাদেই বড়ো বড়ো ছবি দিয়ে এবং মডেল দিয়ে বোঝানো আছে কীভাবে ওখানকার আদিবাসীদের ওপর অত্যাচার করে তাদের মধ্য অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এই রিয়ালটো টাওয়ার এর একটি তলায় আছে - ভিক্টোরিয়া পাওয়ার কন্ট্রোল সিস্টেমের মেন্ কন্ট্রোল ইউনিট। বিশাল বিশাল ডিজিটাল ডিসপ্লে দিয়ে দেখা যাচ্ছে কোন এরিয়া তে কতটা পাওয়ার ফ্লো করছে। যখন বেশি পাওয়ারের দরকার হয় - তখন ওখান থেকেই সুইচ টিপে রিমোট কন্ট্রোলে চালু করা হয় - ওখান থেকে বহুদূরের জিলং এ ন্যাচারাল গ্যাস পাওয়ার স্টেশন। ওখানের মতো গুরুত্ব পূর্ণ জায়গাতেও দেখেছিলাম দর্শকদের ওখানকার সব কিছুর ছবি তুলতে উৎসাহ দিতে।

এরই কাছাকাছি আছে বিখ্যাত ক্রাউন ক্যাসিনো। ইয়ারা নদীর ধারে এখানে পৃথিবীর সমস্ত ধনকুবেরের আড্ডা। ইয়ারা নদীর ধারে শীতকালে স্বল্প বসনা সুন্দরীদের যাতে না কোনো অসুবিধা হয়, তার জন্য এক অদ্ভুত ব্যবস্থা করা আছে। পুরো ক্রাউন ক্যাসিনোকে ঘিরে প্রায় পঞ্চাশটির মতো বড়ো বড়ো স্তম্ভ আছে। সেখান থেকে গ্যাসে আগুন জ্বালানো হয়, আর তাতেই নদী তীরবর্তী পুরো জায়গাটা গরম হয়ে ওঠে।

ক্রাউন ক্যাসিনোর ভেতর নানান রকমের লেজার শো, আলোর খেলা হয়ে চলে আর কুড়িতলা বাড়িটির প্রায় প্রতিটি তলায় আছে বিভিন্ন ধরণের জুয়া খেলার নানান সরঞ্জাম। এরই একটু দূরে আছে কনভেনশন সেন্টার যার একটি বড়ো অংশেই আছে Madame Tussaud-র মোমের মূর্তির প্রদর্শনী। অসাধারণ সব মোমের মূর্তি আমার প্রথম ওখানেই দেখা।

মানুষের জীবনের যে কি ভীষণ মূল্য ওরা দেয়, সেটা বুঝেছিলাম একদিন। একদিন কলেজ যাবার সময় বললো বাস ঘুরিয়ে দেওয়া হবে, কারণ সামনে একটা এক্সিডেন্ট হয়েছে। অগত্যা নেমে পড়লাম বাস থেকে। কিছুটা এগুতেই যে চৌরাস্তার ক্রসিং টা, সেখানে দেখলাম একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম সেই মৃতদেহকে ফোকাস করে অজস্র টেলিভশন চ্যানেলের ক্যামেরা ধারাবিবরণী দিয়ে চলেছে।

অনেকগুলো পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে, বেশ কিছু পুলিশ তদন্ত করে চলেছে। কিন্তু সবচেয়ে অবাক হলাম – দেখি সেই অকুস্থলের মাথার ওপর হেলিকপটার চক্কর দিচ্ছে। শুনলাম আগের রাতে কোনো মাতাল রাস্তা পেরুতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে।

বাকি রাস্তা হেঁটেই চলে গেলাম। কিন্তু রাতে বাড়ি ফিরে প্রায় সব টেলিভিশন চ্যানেলেই দেখলাম সেই এক্সিডেন্ট স্পটের deferred লাইভ প্রোগ্রাম দেখাচ্ছে এবং খুব উত্তপ্ত আলোচনা চলছে – এরকম এক্সিডেন্ট হবে কেন? এর কি কোনো প্রতিকার নেই? মানুষের মূল্যবান জীবন কি এরকম ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে? না কি এসব হতে দেওয়া যায়? সরকারকে এমন কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে খুব তাড়াতড়ি যাতে এরকম দুর্ঘটনা আর কোনোদিন ও না ঘটে!

আমার ওই কলেজের বন্ধু ফিলিপ একদিন টিফিন টাইমের সময় বললো – সে ভারতীয় খাবার কোনোদিনও খায় নি। তবে শুনেছে – খুব নাকি ভালো খেতে হয় সে সব রান্না। আমি বললাম বেশ তো, উইকেন্ডে এস আমার আপার্টমেন্টে, আমি রান্না করে খাওয়াবো। ও এক কথায় রাজি। তারপরেই বললো – তুমি যদি কিছু মনে না করো – আমার গার্ল ফ্রেন্ড কে নিয়ে যেতে পারি? আমার মতো ওরও ভারতীয় খাবারের ওপর খুব আগ্রহ। আমি বললাম – ঠিক আছে, তোমরা দুজনেই এসো। ও বললো – খুব ভালো কথা, কিন্তু আমরা দুজনেই মাছ, মাংস এসব কিছুই খাই না। তবে ডিম খাই।

পরের শুক্রবার একটু তাড়াতাড়িই কলেজ থেকে উঠে Safeway তে গেলাম। এই বিশাল মল এ প্রায় পৃথিবীর সব কিছুই পাওয়া যায়। ওদের জন্যে কিছু ভেজিটেবল ছাড়াও কিনলাম ৬৫ গ্রাম ওজনের সব চেয়ে বড় সাইজের ডিম, পনির ইত্যাদি। খুঁজে বার করলাম পাঁচফোড়ন, জিরে এগুলোও। তারপর বাড়ি ফিরে ওদের জন্য প্রচুর রান্না করলাম বেশ অনেকগুলো পদ।

ওরা দুজন ঠিক সময়েই এল এবং সময় নষ্ট না করে খেতে বসে গেল। অন্যদিন আমি নিজের জন্য সাধারণত প্রতি শনিবার বেশি করে রান্না করে রাখা খিচুড়ি খেতাম আর একটা করে ওমলেট করে নিতাম। কিন্তু ওরা খাবে বলেই সেদিন অনেক রকম রান্না করে ছিলাম। আশা ছিল নিজেও একটু ভালো মন্দ খাবো সেদিন। কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে ওরা দুজন আস্তে আস্তে সব রকম রান্না পুরোটা নিজেরাই খেয়ে ফেললো। এমনকি ভাজা পাঁচফোড়ন ছড়ানো টমেটোর চাটনি অবধি পুরোটা খেয়ে ফেললো। যদিও সে রাতে আমায় মুড়ি খেয়ে কাটাতে হয়েছিল কিন্তু তবুও ওদের প্রশংসার উচ্ছাস দেখে ভীষণ ভালোও লেগেছিলো।

ওরা যাবার সময় বললো – তুমি আজ এতো ভালো আমাদের খাওয়ালে – যে এর পরিবর্তে তোমায় আমরা কিছু গিফট দিতে চাই। আমরা জানি যে তুমি খুব ঘুরতে ভালোবাসো আর ছুটির দিন সারাদিন বেড়াতে যাও, তাই তোমায় আমরা কাল সকাল এ একটা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেতে চাই যেটা ব্রিসবেনের দিকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে। এখানে গাড়ি ছাড়া তুমি যেতে পারবে না। সকাল ৮ টার মধ্যে আসবো, রেডি থেকো।

এর চেয়ে ভালো গিফট আমার কাছে আর কিছুই হতে পারে না। পরের দিন সকল বেলা চললাম ওদের সঙ্গে সেই অসাধারণ জায়গাটা দেখতে।

ওরা আমায় নিয়ে গেল শহর থেকে অনেক দূরে Twelve Apostles দেখাতে। ফ্রিওয়ে দিয়ে প্রায় ঘন্টা তিনেক গাড়িতে উড়ে এসে - এলাম অটোয়া ন্যাশনাল পার্ক। ওরা বললো - এখানে একটা সুন্দর ওয়াটারফল আছে, নাম Erskine Waterfall. তার সামনে গিয়ে দেখলাম প্রচুর লোক নানান ভঙ্গিতে, কেউ শুয়ে, কেউ বসে ছবি তুলে চলেছে। কিন্তু কিসের ছবি তুলছে- সেটাই বুঝতেই পারছিলাম না। ফিলিপকে বলতেই আমায় আঙ্গুল দিয়ে দেখালো, বললো - ওই তো ওয়াটারফল। দেখতে পাচ্ছো না? আমি তো অবাক, ওই যে উঁচু পাথরটা থেকে একটু একটু জল পড়ছে, ওটাই ওয়াটারফল। মনে মনে ভাবলাম, হায়রে। তুমি আমাদের দেশে একবার গিয়ে কাছাকাছি অন্ততঃ দার্জিলিং টাও একবার যদি যাও, দেখবে কয়েক ফুট দূরে দূরে এরকম, এরকম কেন, এর চেয়ে অনেক ভালো ওয়াটার ফলস দিয়ে প্রকৃতি উজাড় করে সাজিয়ে রেখেছে।

যাইহোক, ওখান থেকে The Great Ocean Road হয়ে আরো কয়েকঘন্টা ফ্রি ওয়ে দিয়ে গিয়ে পড়ল Twelve Apostles. কিন্তু তার আগে বলি, যদি কোনো বড়ো রাস্তায় অন্য রাস্তার ক্রসিং থাকে, সেগুলিকে ওরা বলে হাইওয়ে। কিন্তু ফ্রি ওয়ে তে কোনো রাস্তার ক্রসিং থাকেনা, তাই চোখ কান বুঁজে এইসব রাস্তায় ১৩০/১৪০ কি.মি. বা আরো জোরে গাড়ি চালানো যায়।

The Great Ocean Road এর একদিকে নীল জলের ভারত মহাসাগর, অন্য দিকে সোজা খাড়া পাহাড়। মনোরম সেই রাস্তায় যেতে যেতে হলিউডের সিনেমার কথা খুব মনে পড়ছিল। এই ধরণের রাস্তায় গাড়ি চালানো দেখা যায় সেখানে। আমার সঙ্গে ছিল সেদিন মান্না দের গানের বেশ কয়েকটা ক্যাসেট। সেই ক্যাসেটে একটার পর একটা গান বেশ জোরে জোরে বাজছিল গাড়িতে। আর সেই গান শুনে ফিলিপরা তো রীতিমতো ওঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং কলকাতাতেও এসেছিল দুবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। সেই গল্প আমার 'মান্না দে মান্যবরেষু' এবং 'মান্না দে' বইতে লিখেছি।

Twelve Apostles আর কিছুই নয়, সমুদ্রের জলের মধ্যে মাথা তুলে থাকা বারোটি বিচিত্র পাথর খন্ড। তাদের নানান রকমের আকৃতি অনুযায়ী কারোর নাম - লন্ডন ব্রিজ, কারোর নাম - দা গ্রোটো এরকম। অত্যন্ত মনোরম জায়গা সেটি। একটি হিন্দি ছবি, মনে হয় 'কমান্ডো' তে পরে সেখানকার ছবি আমি দেখেছি। নায়ক-নায়িকা নাচছে ওখানে।

ওখান থেকে ফেরার পথে একটা মালয়েশিয়ান রেস্টুরেন্টে 'গাদো গাদো' নামের এক বিচিত্র খাবার খাওয়ার ঘটনা কোনোদিন ও ভুলবো না। বাঁধা কপির পাতা গুলো খুলে একটু নুন আর sauce দিয়ে ভাপানো একটা অসহ্য খাবার, তার কিন্তু গাল ভর্তি নাম – গাদো গাদো। আর তার দাম ও বেশ সমীহ করার মতো।

মেলবোর্ন শহরে গাঢ় খয়েরি রঙের কয়েকটি ট্রাম চলে। এটি প্রধানত টুরিস্টদের জন্য। এতে বিনা পয়সায় যত ইচ্ছে ঘোরা যায়। এই ট্রাম যখন বোটানিক্যাল গার্ডেনের পাশ দিয়ে ক্যাপ্টেন কুক -এর বাড়ির পাশ দিয়ে যায় - তা সত্যিই দেখার মতো।

একবার মনে আছে হাতে অনেকটা সময় ছিল বলে ওখানে সবুজ গালিচার মতো ঘাসের ওপর শুয়েছিলাম অনেকক্ষন। মাথার ওপর ঘন নীল আকাশ দেখছিলাম সবুজ ঘাসের গালিচার ওপর শুয়ে শুয়ে। এমন সময় একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা এসে আমার কাছে দাঁড়ালেন। আমি ওনাকে দেখে উঠে বসলাম। উনি হটাৎ আমার পরে থাকা চেক শার্টটা দেখে ভীষণ প্রশংসা করতে শুরু করলেন। শার্টের কল্যানে আমার কাছে সপ্রশংস চোখে জানতে চাইলেন - আমি কোন দেশ থেকে এসেছি, এতো সুন্দর শার্ট কারা বানিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার উত্তর শুনে খুব খুশি হয়ে বললেন আমায় একবার অন্তত ইন্ডিয়াতে, কলকাতায় যেতে হবে তোমাদের টেক্সটাইল গুলো দেখতে।

নিজের দেশের জন্যে খুব গর্ব হলো তখন। সাথে সাথেই খুব দু:খও হল এই ভেবে, যে দেশের একটা টেক্সটাইল প্রোডাক্ট এতটা ভালো হতে পারে, সেখানে রাস্তার ধারের এরকম একটা এতো সুন্দর সবুজ বাগান কেন করতে পারেনা, আর করতে পারলেও কেন সেটা সেভাবে রাখতে পারেনা!

সেরকম দূরে কোথাও বেড়াতে না গেলে চেষ্টা করতাম রবিবারের সন্ধেটা ওখানকার আলবার্ট পার্কের ইসকন মন্দির এ যেতে। যেতাম যতটা না ভক্তির টানে, তার চেয়ে অনেক বেশি উৎসাহ ছিল ওদের গানবাজনা শেষ হবার পর যে পোলাও, ছানার তরকারি, পায়েস - এসব খাবার খাওয়ায় যত্ন করে - সেই টানে। তবে সেই সব বিদেশী সাহেব, মেমরা যেভাবে কৃষ্ণ নামে মাতোয়ারা হয়ে, আত্মহারা হয়ে নাচতো এবং ভগবৎ গীতার যেভাবে সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিত - তা সত্যিই মনে রাখার মতো! অনেক উৎসাহী জনতাকেও দেখেছি সেখানে উঁকি ঝুঁকি মেরে কৌতুহল মেটাতে এসে কখন যেন ওদের গানে, গানের সুরে ভুলে গিয়ে গিয়ে নাচতে শুরু করে দিতো।

মেলবোর্ন শহরে রাস্তা পারাপার করার জন্য প্রতিটি মোড়ের মাথায় একটি করে পোস্ট আছে। তাতে সুইচ আছে। রাস্তা পেরোবার ইচ্ছে হলে এই সুইচ টিপে অপেক্ষা করতে হয়। এর কিছুক্ষন পর গাড়ির সিগন্যাল লাল হয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। তখন ই একমাত্র রাস্তা পেরোনো যায়।

একবার ওখানে একটা Ab-originals-দের মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। মেলা মেলারই মতো, অবশ্য এখানের মতো পাঁপড় ভাজা পাওয়া যায় না। এখানে প্রধানত Ab-originals-দের কুটিরশিল্পে তৈরি নানান জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছিল। সেখানে তবে তার চেয়েও অবাক হয়েছিলাম যখন সন্ধে হবার পরে ইয়ারা নদীর জল স্প্রে করে নদীর ওপরেই একটা Water-Screen-এর মতো তৈরি করে তার ওপর লেজার শো শুরু হলো। একটা রূপকথা দেখানো হচ্ছিল। সেটি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য তারপরে সিঙ্গাপুরে ও সমুদ্রের জল স্প্রে করে একই ধরণের লেসার শো আমি দেখেছি।

মেলবোর্নেই আমি প্রথম ATM Machine দেখি। রাস্তার ধারে ফুটপাথের ওপর মাঝে মাঝেই স্টিলের বাক্সের মতো রাখা আছে। সেখান থেকে লোকে কার্ড দিয়ে টাকা তুলছে।

এরকমই আরেকটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আমন্ত্রণে আমি হংকংয়েও গেছি। সেটা ছিল হংকং-এ থাকার প্রথম দিন। হংকং-এ পৌঁছে বাড়িতে চিঠি দিতে হবে বলে পোস্টঅফিস খুঁজছিলাম বেশ

কিছু সময় ধরে। যাকেই বলি – অনেক ডাইরেকশন দেয়। কিন্তু আমি কিছুতেই আর পোস্টঅফিস খুঁজে পাইনা। শেষে একটা লোকের মনে হয় আমায় দেখে খুব দয়া হল। আমায় বললো, পোস্টঅফিস খুঁজছো কেন? বললাম – স্ট্যাম্প কিনবো, চিঠি পোস্ট করবো। ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন – তার জন্যে পোস্ট অফিস খোঁজার কি আছে? এই তো রাস্তার ধারে ধারে এতো বাক্স দেখছো, এখানে কয়েন ফেলো, টিকিট বেরিয়ে আসবে। তারপর এই স্লট এ এনভেলাপটা ঢুকিয়ে দাও!

হংকং এ দোতালা ট্রাম এ চেপে ঘুরে বেড়ানোও খুবই মনোরম এক অভিজ্ঞতা।

তখন হংকং থেকে কাউলুন যেতে হতো জাহাজে, কিন্তু এখন শুনেছি সমুদ্রের তলা দিয়ে বিশাল সুড়ঙ্গ হয়েছে, সেখান দিয়ে গাড়ি সরাসরি চলে যায়।

যাইহোক, আবার মেলবোর্নেই ফেরা যাক! মেলবোর্নের মতো সিডনিও খুব সাজানো শহর, বিশেষ করে ডার্লিং হারবার, চাইনিস গার্ডেন এলাকা। অবশ্য মেলবোর্ন অনেক বেশি সুন্দর, সাজানো এবং শান্তিপ্রিয় মানুষদের বাস।

সিডনির ডার্লিং হারবারের পাশেই আছে বিখ্যাত অপেরা হাউস। এখানে একসঙ্গে দশ হাজার দর্শক বসে অপেরা শুনতে পারে। সেখানে অপেরা শোনার একটা অলিখিত নিয়মও ছিল সেই সময়ে। দর্শকদের সেই পুরোনো দিনের পোশাক পরে ঘোড়ার গাড়ি করে আসতে হবে। অপেরা হাউসের ঠিক বাইরেই একটা বড়ো পাথরের ওপর লেখা আছে সেই অপেরা হাউস তৈরির ইতিহাস। এখানে প্রায় শ'খানেক সাজঘর দেখেছি আমি। কোনোরকম সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার না করেই নাকি অভিনেতার প্রতি কথা, প্রতিটি গান শোনা যায় হলের প্রতিটি কোন থেকে।

এই ডার্লিং হারবার চত্বরেই বিনা পয়সার মনোরেল চলে। যতক্ষন খুশি ট্রেন এ চেপে ঘুরে বেড়ানো যায় সেখানে। এর পাশেই আছে বিখ্যাত মেরিটাইম মিউজিয়াম, চাইনিস গার্ডেন এবং IMAX Kodak থিয়েটার। এই কোডাক থিয়েটারে প্রায় একশো কুড়ি ফুট লম্বা স্ক্রিনে সিনেমা দেখার রোমাঞ্চ ভোলার নয়।

ডার্লিং হারবার থেকে একটু দূরে আছে Sea Life Auarium. এখানে সমুদ্রের তলায় মোটা কাঁচের পাইপের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে হয়। সে এক অন্য অভিজ্ঞতা। যেখান দিয়ে হাঁটছি, তার মাথার ওপর, চারিদিকে জল আর সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বড়ো বড়ো বিচিত্র রঙের মাছ ও জলজ প্রাণী। বিশাল বড়ো বড়ো হাঙ্গর ও আছে সেখানে। আগের উল্লেখ করা হিন্দি সিনেমাতে ওই জায়গাটাও দেখিয়েছে। জলের আর কাঁচের refracting ইনডেক্স একই বলে , ভালো করে না দেখলে বোঝাই যায় না কোনটা কাঁচ আর কোনটা জল।

মেলবোর্নে বেশ কিছুদিন থাকার সুবাদে ওখানকার অনেক বাঙালি পরিবার এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দেখেছি পরবর্তী প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের বাঙালি বানানোর জন্য তাঁদের কি আপ্রাণ প্রয়াস। সপ্তাহ শেষে অনেক বাড়িতে খাওয়া দাওয়া এবং গান বাজনার আমন্ত্রণও পেয়েছি। খুব উচ্চপদস্থ চাকরি করেও তাঁরা কি ভীষণ রকমের সাধারণ এবং অতিথি পরায়ণ তা না দেখলে আমার কোনোদিনই বিশ্বাস হতো না। নারায়ণ দা - অদিতি বৌদি, মৌলি দা - আরাধনা বৌদি, প্রতীশ দা -টুকু বৌদির সাথে তো আমার এখনও যোগাযোগ আছে। আরাধনা বৌদির কাছেই আমি প্রথম

খেয়েছিলাম ইতালিয়ান পাস্তা, অদিতি বৌদির করা বিরিয়ানির স্বাদ ও মুখে লেগে আছে এখনও। টুকু বৌদি খাইয়েছিলেন আমায় কিং সাইজের দুর্দান্ত গলদা চিংড়ির মালাইকারী।

নিজের চোখে দেখবো বলে সারা রাত একবার নাইট ক্লাবেও কাটিয়েছি। বিচিত্র সে অভিজ্ঞতা। কিন্তু খুব সঙ্গত কারণেই সেসব এখানে বলা যাবে না।

প্রতি রবিবার ভোর বেলা ট্রেন এর টিকেট কেটে চলে যেতাম কোনো প্রান্তিক স্টেশন এ। তারপর সেখান থেকে অজানা সব বিচের ওপর দিয়ে সারাদিন হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসতাম। এই শহরটা প্রায় চার দিকেই সমুদ্র দিয়ে ঘেরা, তাই বিচ বরাবর হেঁটে ফেরাটাও কোনো অসুবিধের ব্যাপার ছিল না।

ওখানে কোনোদিনও আমি এখানকার মতো কাক দেখতে পাইনি। দেখেছি বড় এবং কুচকুচে কালো দাঁড়কাক আর অজস্র সিগাল পাখি।

ওখানে চার রকমের ক্যাঙ্গারু পাওয়া যায়। প্রধানতঃ ওরা নিরামিষাশী হলেও একধরণের ক্যাঙ্গারু কিন্তু আমিষ খায়। আবার ক্যাঙ্গারুর পরম শত্রুও আছে ওখানে। তাদের নাম বিংগো। এরা এক ধরণের কুকুর, কিন্তু এদের প্রিয় খাবার ক্যাঙ্গারুর মাংস।

ওখানের অনেক লেক এ দেখেছি কালো রঙের রাজহংস। এদের গলার কাছটা টুকটুকে লাল। সাদা রাজ হংস র পাশেই যখন এরা ঘুরে বেড়ায় লেকের জলে, তখন তা দেখতে সত্যি এ খুব সুন্দর লাগে।

একদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম পৃথিবী বিখ্যাত Victoria Bitter নামের বিয়ার ফ্যাক্টরি তে। সারা পৃথিবীর ৬০% বিয়ার নাকি এরা সাপ্লাই দেয়। একটা কারখানা যে এতো বড়ো হতে পারে - তা নিজের চোখে না দেখলে কোনোদিনও বিশ্বাস করতাম না। গাড়িতে করে এই কারখানার পরিধি বরাবর ঘুরতে বেশ কয়েক ঘন্টা লাগবে। কিন্তু এতো বড়ো কারখানায় তখন ই পুরোপুরি অটোমেশন এ চলে। মাত্র কয়েকজন লোক মিলে সেই কিশাল কারখানা চালায়।

আরো কত কী দেখেছি, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি - তা এই স্বল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়। শুধু দুটো ঘটনার কথা বলবো এখানে যা শুনলে বোঝা যাবে যে একটা দেশ উন্নত হয়ে উঠতে গেলে সেখানকার মানুষদের কতটা সৎ ও নিয়মনিষ্ঠ হতে হয়।

প্রথম ঘটনাটা এইরকম - মেলবোর্নে আমাদের কলেজের উল্টোদিকেই ছিল হ্যাডেলবার্গ পোস্টঅফিস। তার পোস্ট মাস্টার ছিল পিটার। প্রায়ই পোস্টেজ স্ট্যাম্প, খাম কিনতে যেতে হতো সেখানে। পিটারের সাথে তাই খুব আলাপ হয়ে গেছিল। একদিন কলেজের টিফিন টাইম এ পোস্টঅফিসে গেছি, টিফিন টাইম বলে সেদিন খুব ভিড় ওখানে। তিন-চারজনের পর আমি ছিলাম, হঠাৎ পেছন ফিরে দেখলাম - আমার পেছনে লাইন দিয়ে আছে স্বয়ং পিটার। আমি খুব অবাক হয়ে ওকে

বললাম - তুমি তো এখানে পোস্ট মাস্টার। তুমি তাহলে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছো কেন? আমায় বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে ও বললো - ও আজ ছুটিতে আছে, কিন্তু হঠাৎ কিছু প্রয়োজনে পোস্টঅফিসে এসেছে খাম কিনতে। আর আজ ছুটিতে আছে বলে - ও আজ শুধুই একজন সাধারণ মানুষ। তাই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে ।

দ্বিতীয় ঘটনাটা - মেলবোর্ন থেকে ফিরে আসার সময় পরিচিত সবার জন্যই কিছু না কিছু উপহার এনেছিলাম। তখন আমার ভাইঝি আর ভাগ্না - দুজনেই খুব ছোট। ওদের দু-জনের জন্য ওখানকার ভিক্টোরিয়া মার্কেট থেকে একটা গান গাওয়া শিম্পাঞ্জি পুতুল আর একটা রেডিও কন্ট্রোলড গাড়ি কিনেছিলাম। কিন্তু কী জানি কেন, সেই গাড়িটা না নিয়েই আমি ভুল করে বাড়ি ফিরে আসি সেদিন। আর যখন সেটার খোঁজ পড়ে আমার, তখন রাত হয়ে গেছে।

ভিক্টোরিয়া মার্কেট একটা বিরাট বড়ো ওপেন মার্কেট। এর ওপর অ্যালুমিনিয়াম এর ছাদ করা আছে, কিন্তু এর চারদিক খোলা। সপ্তাহের তিনদিন সেখানে বাজার বসে। খেলনাটা না পেয়ে ওই মার্কেটের ফোন নম্বর খুঁজে বার করে ফোন করলাম ওদের অফিস এ। ওরা পরের মার্কেটের দিন সকালে যেতে বললো। পরের দিন গেলামও। কিন্তু অনেক খুঁজেও সেখানে ওই দোকান এবং দোকানিকে দেখতে পেলাম না। ঠিক সেই জায়গায় সেদিন অন্য কিছু নিয়ে অন্য লোক বসেছে। সেই দোকানটা না খুঁজে পেয়ে মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেলো। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে সেই মার্কেটের অফিস এ গেলাম। ওরা জানতে চাইলো - আগের দিনের স্টল নম্বর কত থেকে ওটা আমি কিনেছিলাম। বলতে পারলাম না। স্টল নম্বর তো দেখে রাখিনি। ওরা তখন কম্পিউটার স্ক্রিনে পুরো মার্কেটের ছবিটা দেখিয়ে জানতে চাইলো - লোকেশনটা ঠিক কোথায় ছিল? স্ক্রিনে দেখে জায়গাটার সম্ভাব্য লোকেশনটা দেখালাম। ওরা বললো - আগের দিনে যে লোকটা ওই স্টলে বসেছিল - সে আজ এতো নম্বর স্টলে বসেছে। সোজা চলে যান, পেয়ে যাবেন। খুঁজে খুঁজে সেই স্টলে গিয়ে দেখলাম সেই লোকটা নেই, এক ভদ্রমহিলা বসে আছে, সেখানেও ওই ধরণের খেলনা বিক্রি হচ্ছে। তাঁকে কিছু না বলে ফিরেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু পরে ভাবলাম - একবার জিজ্ঞেস করেই দেখিনা - যদি কিছু জানে। তাঁকে বললাম পুরো ঘটনাটা। জানতে চাইলাম - আপনি কি তাঁকে চেনেন? - কিন্তু ভদ্রমহিলা আমার কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠলেন- ওটা তো আমার ভাই। আগের দিন ও এসেছিল, আমি আসিনি। কিন্তু ভাই আমায় ঘটনাটা বলেছিল। আপনার কোনো চিন্তা নেই। নিয়ে যান আপনার খেলনাটা। আমি রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম। ভদ্রমহিলা একবারও বিল দেখতে চাইলেন না, নাম ধাম জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলেন না। একটুখানি ঘটনাটা শুনেই বিনা বাক্যব্যয়ে খেলনাটা আমার হাতে তুলে দিয়ে যেন নিজেকে দায়িত্ব মুক্ত করলেন। বুঝলাম, সততা বলে একটা কথা খুব সঙ্গত কারণেই এখনো এই পৃথিবীতে টিকে আছে আর সেইজন্যই বোধহয় এখনও পৃথিবী বাসযোগ্য হয়ে আছে এবং হয়তো তা থাকবে ও ভবিষ্যতে।

কিছু ছবি

ফ্লিন্ডার্স স্ট্রিট স্টেশন

ক্রাউন ক্যাসিনো র চারদিক গ্যাস জ্বেলে গরম করা হচ্ছে, ইয়ারা নদীতে তার ছায়া

মেলবোর্ন স্টেট লাইব্রেরি

মেলবোর্নের সাজানো রাস্তাঘাট

পাফিং বিল্লির লেক

ফিলিপ আইল্যান্ড

MCG স্টেডিয়ামের গেট

MCG স্টেডিয়াম

মেলবোর্নের ইসকন মন্দির

ঘরোয়া আসরে গান বাজনা

কলেজের কম্পিউটার ল্যাবরেটরি

কলেজে জর্জ ও পিটার এর সাথে

ভিক্টোরিয়া বিটার কোম্পানি

মারুন্ডা লেক

রিয়ালটো টাওয়ার থেকে দেখা মেলবোর্ন

টুয়েলভ আপোস্টলস

বন্ধু ফিলিপের সাথে বেড়ানো

টুয়েলভ আপোস্টলস

রিয়ালটো টাওয়ার

মেলবোর্নের রাস্তায় স্ট্যাচু সেজে ভিক্ষে করা

ডার্লিং হারবার - সিডনি

মনো রেল স্টেশন - সিডনি

অপেরা হাউস - সিডনি

২০০০ সালের সিডনি অলিম্পিক গেমস ভিলেজ

বালারাট এ সোনার প্রদর্শনী

বালারাট এ সোনার খনির ভেতর মডেল

ইলিশের ইতিকথা

কিছু অজানা কথা ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ, কিন্তু অবাধ বিচরণ পৃথিবীর অনেক দেশ জুড়ে। ইলিশের যাত্রা পথ বড়োই রোমাঞ্চকর। কখনো এরা বঙ্গোপসাগর থেকে দক্ষিণের উপকূল ছুঁয়ে ভারত মহাসাগর হয়ে চলে আসে আরব সাগরে, আর সেখান থেকে ওমান হয়ে পারস্য উপসাগর। আবার কখনো বঙ্গোপসাগর থেকে আন্দামান হয়ে চীন সাগরের পথে। ইলিশ মূলত এক সামুদ্রিক মাছ, বসবাস নোনা জলে, কিন্তু ডিম্ পাড়তে আসে নদীতে। ডিম্ পেড়ে সাগরে ফেরার পথে ধরা পড়ে জেলেদের জালে, তারপর আমাদের পাতে। যদিও আমার নদীর ইলিশ খাবার বিশেষ সৌভাগ্য হয়নি তবে আরব সাগরের ইলিশ ছিল ভাতে-পাতে সাথে ২৭ বছর ধরে। এর পরেও ইলিশকে পেয়েছি বহু দেশের যাত্রাপথে; ভারত ছাড়িয়ে ইরান হয়ে দক্ষিণ চীনের দেশে, আর সেখান থেকে ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড হয়ে মিয়ানমারে, ইরাবতীর জলে। এবার ফিরে আসি ইলিশ বিলাসীদের কিছু অজানা কথায়। একটা ইলিশ মাছ ডিম্ ছাড়তে পারে ২০ লক্ষ পর্যন্ত। এক কেজি ওজনের হতে সময় লাগে প্রায় ১ বছর। এ সময় এদের মোট কাঁটার সংখ্যা থাকে ১৩৮ টা; ৭৪ টা 'Y' পিনের মত এবং ৬৪ টা সোজা 'I' পিনের মত দেখতে। ছবিতে দিলাম। নিজের হাতে তোলা ছবি ভুবনেশ্বরের কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণাগার থেকে। কর্ম সূত্রে তখন আমি বিশ্বব্যাংকের অনুদানে এক প্রজেক্টের পরামর্শদাতা।সর্বোপরি ইলিশের জিনোমে রয়েছে ৭৬ লক্ষ ৮০ হাজার নিউক্লিওটাইড, যা মানুষের জিনোমের প্রায় এক-চতুর্থাংশ , যা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত।

লেখা :: মুক্তিসাধন বসু ভূতপূর্ব ডিরেক্টর, ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ

ঘুরে এলাম নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার

তনুরুপা কুন্ডু সঙ্গে দিলীপ কুন্ডু

২০১৯ এর নভেম্বর এ আমরা মেয়ের কাছে কয়েক মাসের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলাম। মেয়ে টেক্সাসের ডালাস শহরে থাকে। সেখান থেকে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমরা এক সপ্তাহের জন্য ওয়াশিংটন ডিসি এবং নিউইয়র্ক বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিয়ে এখন পর্যন্ত পাঁচটি কিস্তি লেখা হয়েছে। তার একটা কিস্তি এখানে দিলাম।.....

..... সেদিন বিকালে আমরা ভাবলাম নিউইয়র্কে এসে cruise, subway train তো চড়া হলো এবার বাসে চড়লে কেমন হয়। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম city tour করার জন্য কিছু private bus service আছে যেগুলোর জন্য আগে থেকে টিকিট বুকিং করতে হয়। এছাড়া পর্যটকদের সুবিধার জন্য নিউইয়র্ক শহরে মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটির (MTA) ফ্রি বাস সার্ভিস পাওয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে তক্ষুনি একটা MTA বাস পেয়ে গেলাম যেটা World Trade Center এর দিকে যাচ্ছে। সেই বাস এ চড়ে বসলাম। বাসে প্রায় জনা দশেক যাত্রী, মনে হলো তারা সবাই পর্যটক। ড্রাইভার সকলকে সুন্দর গাইড করে দিচ্ছে। আমরা মিনিট সাতেকের মধ্যে World Trade Center এ পৌঁছে গেলাম।

নিউইয়র্ক শহরের Lower Manhattan Financial District এ World Trade Center অবস্থিত। সাতটি বিল্ডিঙের সমন্বয়ে তৈরি আসল World Trade Center টি 1973 সালের 4th April উদ্বোধন হয়েছিল। এর মধ্যে দুটি পাশাপাশি ১১০ তলার বিল্ডিং ছিল। উচ্চতায় প্রথম WTC বিল্ডিংটি ছিল 1,368 ফুট ও দ্বিতীয়টি ছিল 1,362 ফুট। এরা Twin Tower নামেও পরিচিত ছিল। তৎকালীন সময়ে এই দুটি বিল্ডিং পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং বলে মানা হতো।

এই সাতটি বিল্ডিং সহ World Trade Center কে 1973 সাল থেকে 2001 সাল পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বড়ো ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তার মধ্যে Feb 26, 1993 সালে বোমাবর্ষণ, Jan 14, 1998 সালে bank robbery এবং July 2001 সালে বিল্ডিং এর ম্যানেজমেন্ট কে লিজিং এর মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা।

এরপর এলো 11th Sep, 2001 সালের সেই অভিশপ্ত দিন। পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষ আতঙ্কে থমকে গিয়েছিল। ঐ দিন স্থানীয় সময় সকাল 8:42 মিনিটে আল কায়দার আতঙ্কবাদীরা দুটি বোয়িং 767 বিমান অপহরণ করে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে প্রথম ও দ্বিতীয় WTC Tower কে আকাশ পথে পরপর আঘাত করে। দুই ঘন্টা সময়ের মধ্যে ১১০ তলা উঁচু উভয় Tower এ আগুন লেগে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। ফলে Tower এর মধ্যে ও কাছাকাছি থাকা 2606 জন মানুষ ও বিমানে থাকা ১৫৭ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়। ভেঙে পড়া জ্বলন্ত Tower দুটির চারপাশে থাকা অন্যান্য দশটি বিল্ডিং ও আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে

ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করতে ও পুনরুদ্ধার করতে আট মাসের বেশি সময় লেগেছিল। তখন WTC এর আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ বিল্ডিং গুলি ও ভেঙে ফেলা হয়।

11th Sept 2001 সালের আতঙ্কবাদী হামলা আমেরিকাবাসীদের মনে গভীর ক্ষত তৈরি করে দিয়েছিল। এরপর নিউইয়র্ক শহরের ল্যান্ডস্ক্যাপ চিরদিনের জন্য বদলে দেওয়া হয়। যে পুরোনো World Trade Center টি ১৬ একর জায়গা জুড়ে ছিল তার অর্ধেক অর্থাৎ আট একর জায়গা নিয়ে তৈরি করা হয় National September 11 Memorial(9/11 স্মৃতিসৌধ) . এটি 11th September 2001 সালে আতঙ্কবাদী হামলায় নিহত 2977 ব্যক্তি ও 26th Feb 1993 সালে বোমাবর্ষণে নিহত ছয়জন ব্যক্তির স্মরণে তৈরি করা স্মৃতিসৌধ। এই স্মৃতিসৌধটি আতঙ্কবাদী হামলার ঠিক দশ বছর পরে, 11th September 2011 সালে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হয়। আমরা সেই বিকেলে 9/11 এর ভয়ানক ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করতে এখানে বেশ কিছুক্ষন সময় কাটালাম।

এই স্মৃতিসৌধর প্রাণকেন্দ্র দুইটি জলপ্রপাত সহ দুইটি সরোবর। এই জলপ্রপাত উত্তর আমেরিকার সবথেকে বড়ো man made জলপ্রপাত প্রায় এক একর জায়গা নিয়ে তৈরি প্রত্যেকটি জলপ্রপাত নির্মাণ করা হয়েছে পূর্বতন উত্তর ও দক্ষিণ টাওয়ার এর ঠিক ভিতের উপরে। সরোবর দুটি চৌকাকৃতি এবং ৩০ ফুট গভীর, উপরে জলপ্রপাত থেকে অনবরত জলধারা এই সরোবরে শান্তভাবে গড়িয়ে পড়ছে। তারপর সরোবরের নিচের কেন্দ্রে থাকা ২০ ফুট গভীর গর্তের মধ্যে সেই জলধারা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

'MICHAEL ARAD' ছিলেন এই সরোবরের স্থাপত্যবিদ। তাঁর কল্পনায় সরোবর দুইটি যেন " অনুপস্থিতিকে দৃশ্যমান করে ". জলপ্রপাতের অবিরাম জলধারা সরোবরের শূন্যতাকে কখনো পূরণ করতে পারছে না। প্রবহমান জলধারার কোমল শব্দ মনে হচ্ছিল মৃত্যুযন্ত্রণার দুঃখকে কিছুটা হলেও প্রশমিত করছিল। এই শব্দ মনটাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

সরোবরের চারদিক ব্রোঞ্জ পরত দিয়ে ঘেরা স্বল্প উঁচু প্রাচীর। এই প্রাচীরের ওপর ৯/১১ এর ঘটনায় নিহত সব ব্যক্তিদের নাম খোদাই করা আছে। North সরোবরের প্রাচীরের ওপর সেই ব্যক্তিদের নাম খোদাই করা আছে যারা north tower এ থাকাকালীন hijacked flight 11 এর আঘাতে এবং 1993 সালের বোমাবর্ষণে নিহত হয়েছিলেন। south সরোবরের প্রাচীরে খোদাই করা আছে তাদের নাম যারা south tower এ থাকাকালীন hijacked flight 175 এর আঘাতে ও পেন্টাগনে hijacked flight 77 ও 93 এর আঘাতে নিহত হয়েছিলেন।

মেমোরিয়াল প্রাঙ্গনে চারশোর বেশি white oak গাছ লাগানো হয়েছে।কষ্টসহিষ্ণু white oak এখানকার স্থানীয় গাছ। ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করার সময় গ্রাউন্ড জিরো তে ধ্বংসস্তূপের নিচে পাওয়া গিয়েছিল একটি callery pear গাছ। যার একটি ডাল ছাড়া অন্যান্য সব ডাল আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। মৃতপ্রায় এই গাছটিকে তখন অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে যত্ন করে বাঁচিয়ে তোলা হয় এবং পরেsurvivor tree নামে পুনরায় এই প্রাঙ্গনে লাগানো হয়। এই survivor tree মেমোরিয়াল প্লাজা প্রাঙ্গনে "সহনশীলতা, আশা ও পুনর্জন্মের " প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই গাছ থেকে তৈরি চারা প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা আতঙ্কবাদী হামলায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় লাগানোর জন্য বিতরণ করা হয়।

আতঙ্কবাদী হামলার পর পুনরুদ্ধারের কাজ চলাকালীন আহত ও ক্ষতিগ্রস্থ উদ্ধারকর্মীদের উদ্দেশ্যে এবং WTC লাগোয়া বিল্ডিঙের অধিবাসী যারা ৯/১১ হামলায় আহত বা নিহত হয়েছিলেন তাদের সমিতির উদ্দেশ্যে মেমোরিয়াল প্লাজা প্রাঙ্গনে একটি বনবীথি (glade) তৈরি করা হয়েছে। এই বনবীথির মধ্য দিয়ে একটি পথ চলে গিয়েছে। সেই পথের দুই ধরে সাজিয়ে রাখা আছে ছয়টি বিশাল সাইজের পাথরের খন্ড। এদের প্রতিটির ওজন তেরো থেকে আঠেরো টন। পুরোনো WTC র ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা স্টিল দিয়ে পাথরের খণ্ডগুলিকে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে "প্রতিকূলতার ভিতরের শক্তি"কে। বনবীথিটি উদ্বোধন করা হয়েছিল 2019 সালের 30th May(ধ্বংসস্তূপের উদ্ধারকার্য সমাপ্তির ১৭ বছর পূর্তির দিন).

মেমোরিয়ালের আশেপাশে বাকি আট একর জায়গা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে নতুন World Trade Center এর ছয়টি আকাশচুম্বী এবং আরো কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিল্ডিং। এরমধ্যে বিশ্বের ষষ্ঠ উঁচু এবং উত্তর আমেরিকার সবথেকে উঁচু বিল্ডিংটি Freedom Tower . এই বিল্ডিঙের নাম Freedom Tower রাখা হয়েছে এর ১৭৭৬ ফুট উচ্চতার জন্য, কারণ ১৭৭৬ সালে আমেরিকা স্বাধীন হয়েছিল।যদিও সাধারণের কাছে এটি "One World Trade Center" নামে পরিচিত। এই Tower টি 3rd November 2014 তে উদ্বোধন করা হয়। এটির 94 তলা রয়েছে মাটির ওপরে ও মাটির নিচে আছে আরো ৫ তলা। এই বিল্ডিং এর উপর থেকে সমগ্র নিউইয়র্ক শহরকে দেখার জন্য ঘূর্ণায়মান observatory(One World Observatory) আছে।

WTC র পরিসরে The Oculus নামে একটি সুন্দর বিল্ডিং রয়েছে যেটি আসলে World Trade Center এর সাবওয়ে স্টেশন। এটি নিউইয়র্ক শহরের অন্যান্য প্রান্ত ও নিউজার্সি শহরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। স্টেশনের চারতলা প্লাটফর্ম সবই মাটির নিচে। মাটির ওপরে আছে Westfield WTC Mall . ঝাঁ চকচকে mall টি দেখলে সবার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। Oculus বিল্ডিংটি ডিজাইন করেন বিখ্যাত স্প্যানিশ স্থাপত্যবিদ Santiago Calatrava . এই বিল্ডিংয়ের বাইরের অবয়ব দেখতে এক উড়ন্ত 'ডাভ ' পাখির মতো। বিল্ডিংয়ের কাঁচ ও স্টিলের তৈরি কাঠামোটি মাটির থেকে অনেক উঁচুতে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই বিল্ডিংয়ের শিল্পনৈপুণ্যতা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই স্টেশনটির মাটির তলা দিয়ে পথ One World Trade Centre এর Observatory ও 9/11 Memorial কে সরাসরি যুক্ত করেছে। আমরা এই Oculus এ বেশ কিছুক্ষন সময় কাটিয়েছিলাম।

নিজেদের বেশ কয়েকটি ছবি তুলে স্মৃতির বাক্সে বন্দি করে রেখে দিয়েছিলাম। কিছু ছবি এখানে দিলাম।

9/11
MEMORIAL
& MUSEUM
POLICE

JOSEPH GRZELAK
MICHAEL
URATOLO
RAYMOND E. M
ROBERT W. SPEAR, JR.

A journey to the ancient 'lost city' of Petra in Jordan

K K Satapathy

I visited Petra in Jordan in March, 2019 reaching Amman from Kolkata via Doha (Katar). Petra is located between the Red Sea and Dead Sea, about 150 miles south of Amman, the capital of Jordan. Petra is a three hour drive from Amman and two hours from the red sea port of Aqaba. The city was inhabited since prehistoric times and was curved out of the sandstone cliffs, amidst desert canyons and mountains. Petra is now an important UNESCO world heritage site and a part of the new seven wonders of the world. It is one of the richest and largest archaeological sites set in a dominating red sand stone landscape. Petra played a vital role as a center of trade and commerce for the silk, spice and other caravan trade routes that linked China, India and southern Arabia with Egypt, Syria, Greece and Rome in ancient times.

Visitor center at the entrance of Petra

Petra dates back to around 300 BC and is the holy city of Nomadic Arab tribe called Nabetians. It is one of the most spectacular civilization of human history. Petra had been the capital of Nabatean kingdom, and located in the intersection of the main commercial routes between the east and the west. During Hellenistic and Roman times, it was a major caravan center for the incense of Arabia, the silks of China and the spices of India. Two thousand years ago, Petra was a fabulously wealthy city and people who knew about Petra boasted its independence and prosperity. The Nabateans successfully fought back the invaders by taking advantage of the mountainous terrain surrounding the city. The mountains effectively served as a natural wall, buttressing Petra.

Tourists walking towards Petra

But all this came to the ears of the Romans who were interested in its wealth and in the year 106 Ad, Romans fought their way in to the valley to conquer and occupy Petra. They built a beautiful road right through the center of the city and the emperor had a gateway erected to commemorate the victory. Under Roman, Petra also prospered. Christianity came to Petra in the third and fourth centuries and flourished. But as the centuries rolled by, the camel caravans that used to plod their

way from Arabia to Jerusalem and Damascus found alternative route by the Mediterranean and bypassed Petra. As a result Petra's popularity waned and its population drifted away and in about 800 years ago, the valley lapsed into silence and was deserted. An earth quake in 363 destroyed many buildings including their main water management system which was vital for their survival. Petra was thus abandoned and forgotten with its the memory lost to the outside world.
In 1812, the Swis explorer Ludwig Burckhardt stumbled across these amazing ruins and came out to tell the world of what he had seen, and put the lost city of Petra back on the map.

A walk through the natural winding deep canyon known as 'Siq'

Petra is called the rock city because it is built in rock but there are also a couple of other names . One of them is the red rose city because of the red rocks. But the name that really appropriate is lost city as the whole city was deserted and lost for thousands of years. During the time it was deserted it was covered in sand and so it became lost until the time it was discovered. Petra is about 37 square miles of curved sandstone ruins. Petra is half built, half-curved into the rock, and is surrounded by mountains riddled with passages and gorges. The area is too rocky and arid. The walls of this ravine are anything up to 100 meters in height ,so it is a very easy place for the defending army to defend with just a few men.As it is essentially a desert area and dry place, the Nabateans developed a unique system of conduits, dams and cisterns to harvest, store and

distribute rainwater which came in winter for year round use. It also improved the crop yields of Nabatean farmers. Petra was therefore became a garden city of fountains, swimming pools and groves and orchards which Persians called paradise, a little bit of heaven on earth.

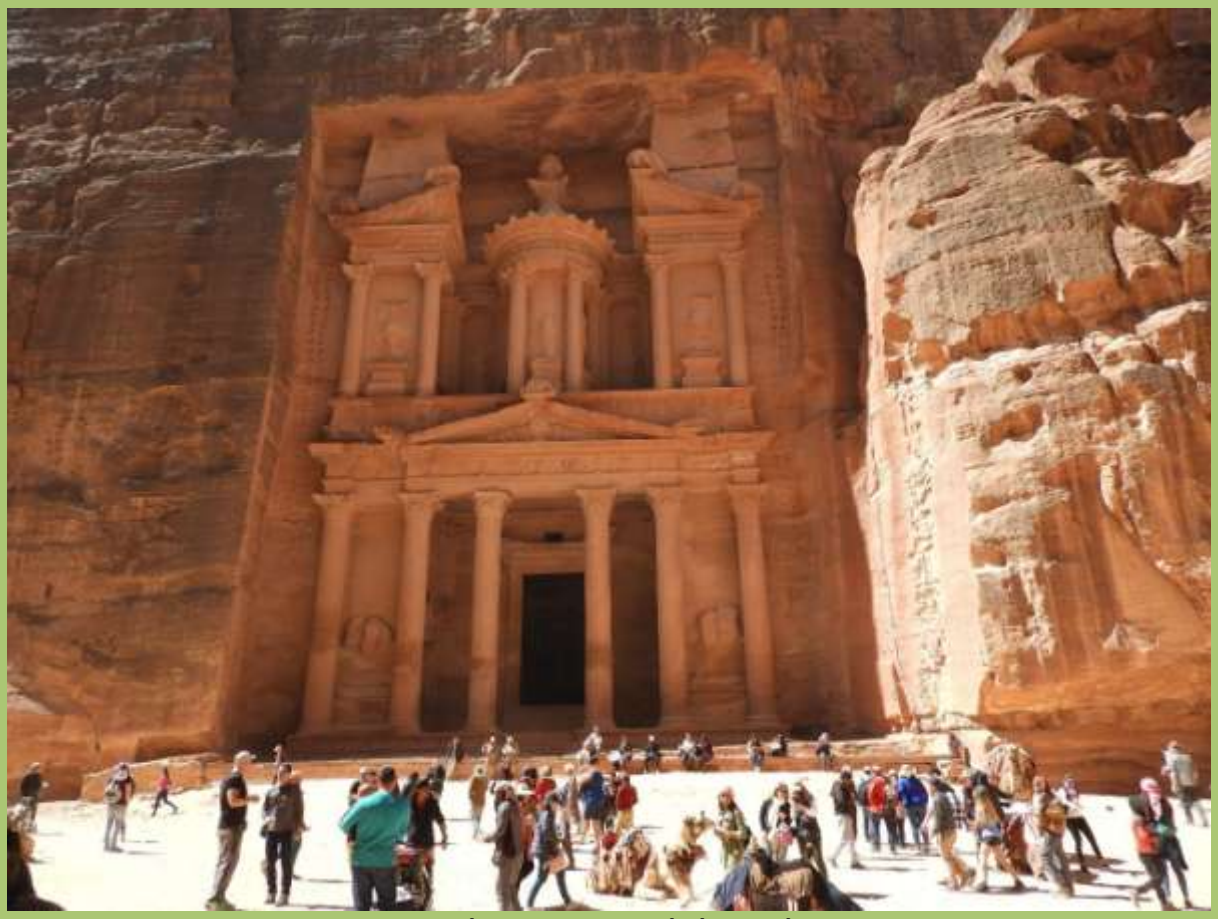

The Treasury or Al Khazanah

At the entrance gate of Petra, there is a visitor center where entry tickets are available. Both inside and outside the gate, vendors sell all sorts of souvenirs from sunglasses to colorful sand bottles with desert scenes. Visitor center operates a store that sells crafts, textiles and jewelry and other items.

Access to the city from the entrance is through a 1.2 kilometer gorge (canyon) called 'Siq'. The siq is a zig zag course through chasm with narrow vertical walls of smooth orange rock and is about 5 meter wide. There are minor carvings here and there throughout the siq including those of colorful and unusual sandstone patterns in the rock walls. There are horse drawn carriages available for transport if one cannot walk. However thousands of years ago, the transport was camels, only they could cross the Arabian desert to enter the Nabatean capital. One of the concerns about walking through canyons was the flash flood because if lot of rain falls somewhere near; so they created waterways where water would flow when there will be the potential flash flood. In some places terracotta pipes built into the sides of the canyon that were

used for carrying water are still in place. However, in 1963 due to flash floods, a number of French tourists died.

Petra's ruins

Upon exiting the Siq, first site viewed is the famous land mark and attraction - the tomb of one of the greatest kings of Nabetians, called Treasury (Khazanah in Arabic), because it is believed that the treasure of the Egyptian Pharoah is hidden here but it may be actually a temple. No one , however, knows what exactly the Treasury was used and when exactly it was built. The façade is adorned with ancient god figures believed to be Eluzza (associated to the Egyptian goddess Isis) as well as Castor and Pollux, sons of Zeus. One can see many architectural designs from the Corinthian columns to the Greek influence and architecture curved into the rock. Its open space surrounded by canyon walls. The 40 meter tall mausoleum is decorated with fancy pattern. The Nabetians did not build it from bottom to the top, they simply started at the top and began to work down and cut these things out of the solid face of the mountain. At the top, there is an urn, which the Arab Bedouins used to think that it was full of beautiful treasures and they took potshots with their rifles and hold out their hands underneath hoping that it split open all these fabulous treasures and pour down into their hands. Though the opinion is divided on whether it is a tomb or temple it is a fantastic piece of architecture and workmanship.
Lawrence of Arabia film was shot here.
The visit was an amazing experience and the feeling was mystical and magical.

Agni Kanya-Bina Das

Dr. Utpala Parthasarathy

The status of women in India has been subject to many changes over the span of recorded Indian history. Their position in society deteriorated very critically till the British Raj when a real reform came in their status, particularly in Bengal. It was those pioneers, who have broken gender barriers and worked hard for their rights and made progress in the field of politics, arts, science. The beginning of twentieth century saw a group of freedom fighters in their stellar status against British Raj. These women, poised with determination in the face of adversity. Despite being oppressed due to the societal pressures coupled with several critical familial responsibilities, joined the independence struggle. They bravely faced the baton of the police and even went behind bars. Hundreds and thousands of Indian women dedicated their lives for obtaining freedom of their motherland.

Srimati Bina Das is one of those brave ladies who died in solitude and anonymity, but her contributions to the struggle for Indian independence should be remembered.

Bina Das born on 24th August 1911 in Kaishnanagar, Bengal Province of British India to the parents who were involved in the freedom struggle indirectly and they used to inspire the overall advancement of women and women's rights in Bengal. Sri Beni Madhab Das and Smti.Sarala Devi, both were social workers and educationists, and were deeply involved with the Brahmo Samaj. The duo believed in giving their children, especially their daughters, freedom, education and instilling a quest for learning which were infrequent personalities in the early 1900s in India. Beni Madhab Das, as a teacher inspired many of his students for the cause of India's freedom, the most notable being Subhas Chandra Bose. Bina Das's mother Sarala Devi used to run a women's hostel named *Punya Ashram* in Calcutta that was actually a storage space for bombs and weapons the revolutionaries used to use. Several occupants of this hostel were the revolutionaries themselves, belonging to various underground groups.

Bina was a student of St. John Diocesan Girls' Higher Secondary School. In her own memoir, Das had mentioned one incidence which had influenced her and some of her friends very strongly against the activity of the School authority. The incidence was 'The British Viceroy's wife was coming to visit their school and they were asked to carry baskets of flowers and scatter the flowers at her feet as she entered the premises'. Bina revolted by the idea. The plan was so insulting for her that on that day she and a few of her friends took a vow with tears in their eyes, that they would sacrifice their lives for the freedom of their motherland. Ms. Das latter on mentioned though it was a childish vow, but in the moments of weakness it gave her strength and hardened her determination.

It might be easy to be a woman today, in the 21st century, but it was not always been this way. There was a time when the word 'feminism' or 'women empowerment' wasn't even coined. There was a time, when women struggled to break society's so-called 'norms' to achieve what they really wanted.

Bose continued to play the role of a mentor in Das's life, especially when she joined Bethune College, under Calcutta University as a college student. He taught her that one's passion for

freedom is more important not the way how to get it. The college library and books that admonished theories of revolution and freedom further encouraged Das's beliefs and hopes for an independent India.

Das, along with her group of fellow students, organised their first student protests against the Simon Commission that arrived in 1928.It was first perception of victory against British oppression. This revolt laid the foundations of what came to be known as the *Chhatri Sangha*, women students' society that was semi-revolutionary in its activities. Bina's sister Kalyani Das , was the secretary of this organisation. It was a group of 100 members from Brahmo Girl's School, Victoria School, Bethune College, Diocesan College and Scottish Church College. They arranged study circles where these young women learned everything from lathi and sword play to cycling motor driving and rifle shooting.

On February 6, 1932, Bina Das walked into the Calcutta University where the then Governor, Stanley Jackson was delivering the convocation speech. Just as the Governor was addressing the crowd, Bina got up from her seat and opened fire at him with the revolver concealed under her gown. But, the Governor escaped unscathed.

Bina Das was only 21 years old and created a history by becoming one of the first women to hold up arms against the British Raj. She was arrested and sentenced to nine years of rigorous imprisonment. But in her own words she said that the action was a symbol of the protest against the British colonial system, which "has kept enslaved 300 million of my countrymen and countrywomen".

Despite of the atrocities and the humiliation that came her way Bina never stopped fighting for freedom. After her release from prison, she participated in the Quit India Movement led by Mahatma Gandhi and also joined the revolutionary club- *Jugantar*. She spent another three years in prison when she held the post of the secretary of the Calcutta Congress Committee.

She married Sri Jatish Bhowmick, a fellow freedom fighter, in 1947. The strong-willed woman did not end her activism even after India achieved independence. She backed Sheikh Mujibur Rahaman during his declaration of revolution in East Pakistan (now Bangladesh) against a violent and authoritarian treatment by West Pakistan administration. She also strongly protested against Emergency called by former Prime Minister Indira Gandhi.

She won the Padma Shri award in 1960 for her "Social Work". In 2012, the certificate of merit was conferred posthumously.

She went low-key after her husband's death, left Kolkata and moved to Rishikesh. She took up a teaching job and did not accept the pension for freedom fighters by the Government. On 26th December, 1986, she breathed her last. Her dead body was recovered from the roadside in a partially decomposed state by the passing crowd in Rishikesh. The police was informed and it took them a month to define her identity. The once acclaimed *Agni Kanya*, whose passion was an independent India, died unknown, unwept and unsung. The nation should remember this somewhat poignant story, even though late, and salute her.

References:

1. *Kumar Radha (1997). The History of Doing:An Illustrated Account of Movements for Women's Rights and Feminism in India 1800-1990. Zubaan. ISBN 9788185107769*
2. Five shots fired at governor *Glasgow Herald*, 8 February 1932, p.11
3. Girl, would- be assassin, gets nine years in India at *Reading Eagle*, 15 February 1932
4. *"Bina Das, Forgotten female freedom fighters". Dnaindia.com. 15 April 2017. Retrieved 30 June 2017.*
5. Sengupta, Subodh Chandra and Anjali Basu (ed.) (1988) *Sansad Bangali Charitabhidhan* (in Bengali), Kolkata: Sahitya Sansad, p. 663
6. *Chatterjee, Indrani. "The Bengali Bhadramahila- Forms of Organisation in the Early Twentieth Century" (PDF). Manushi: 33-34*
7. *"Padma Awards Directory (1954-2014)" (PDF). Ministry of Home Affairs (India). 21 May 2014. Pp. 11-37. Archived from the original (PDF) on 15 November 2016. Retrieved 22 March 2016.*
8. *"After 80 yrs, posthumous degrees for revolutionaries- Times of India". The Times of India. Retrieved 21 December 2017.*

ARICARE

ARICARE সাংস্কৃতিক কমিটির পক্ষে :